শিক্ষক হুমায়ুন আজাদ, যখন আমি তাঁর ছাত্র

চঞ্চল আশরাফ

১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হই আমি। আর হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৮৯ সালে। এর আগে, তাঁকে লক্ষ করেছি বাংলা বিভাগের সামনে, করিডোরে, লেকচার থিয়েটার বিল্ডিং থেকে বের হয়ে কলা ভবনের দিকে, বা, কলা ভবনের পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে বের হয়ে দক্ষিণের পথটা ধরে হেঁটে যেতে। তাঁর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা এসবের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ তখনও তাঁর সরাসরি ছাত্র হইনি আমি। তো, সেই ঘটনাটার কথা বলি।

বাংলা বিভাগের করিডোরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলাম। হুমায়ুন আজাদকে আসতে দেখে আমি সিগারেটটা ফেলে জুতা দিয়ে চেপে রাখলাম। উনি কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, ‘তুমি কি বাংলা বিভাগের ছাত্র?’ বললাম, ‘হ্যাঁ’। ‘সবাই জ্বি বলে, তোমার কি হ্যাঁ বলার অভ্যাস? ভালো। কিন্তু সিগারেট ফেলে দিলে কেন?’ আমি চুপ। উনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই বাবার টাকায় খাও। কিন্তু সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে শ্রদ্ধার কোনও সম্পর্ক নেই, যেমন নেই পান খাওয়ার সঙ্গে। বুঝেছ?’ বলেই হাঁটা, ডিপার্টমেন্ট অফিসের দিকে। এরপর, একই বছরে, নতুন প্রজন্ম পাঠচক্র নামে আমাদেরই এক সংগঠনের সেমিনারে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভাষা ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে, আলোচক হিসেবে তাতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা সেখানেই প্রথম শুনি। ওই অনুষ্ঠানে তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল, প্রতিটি প্রবন্ধের ওপর একজন আলোচক ছিলেন। কোন প্রবন্ধের ওপর তিনি আলোচনা করেছিলেন মনে নেই, হুমায়ুন আজাদ ছাড়া কোনও আলোচকের নাম মনে পড়ে না; শুধু এবরার হোসেন-লিখিত ‘ছড়ায় সমাজ-বাস্তবতা’ নামের প্রবন্ধটির কথাই এ-মুহূর্তে মনে পড়ছে। যা-ই হোক, ‘প্রবন্ধ হিসেবে এখানে যা পঠিত হয়েছে, তা আসলে গোলমেলে বাক্যে পরিপূর্ণ অর্থহীন রচনা’Ñ তাঁর এই কথাটাই কেবল মনে আছে। সম্ভবত, এর লেখক ছিলেন আমার একসময়ের বন্ধু ও সহপাঠি পিনাকী রায়। তাকে যে কেন প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন মিহির মুসাকী, আজও বুঝতে পারি না। সে অন্য কথা। মনে পড়ে, হুমায়ুন আজাদ, লুৎফর রহমান রিটন,

আমীরুল ইসলাম, সরকার আমিন, মিহির মুসাকী, মাহবুব মাসুম (এখন মাহবুবুল হক)সহ আমরা হাকিম ভাইয়ের দোকানে চা খেয়েছি সেই শীতের সকালে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে।

সরাসরি হুমায়ুন আজাদের ছাত্র আমি হই ১৯৯১ সালে, তৃতীয় বর্ষ থেকে, তিনি পড়াতেন তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। এই নামে তাঁর একটা বই আছে, এর মৌলিকত্ব নিয়ে যত আপত্তি থাকুক না-' কেন, আমি মনে করি বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব-সম্পর্কিত বইগুলোর মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ; ভাষাতত্ত্বের মতো নিরস ও কাঠখোট্টা বিষয়ে এত আনন্দদায়ক ও কৌতূহল-জাগানো বই সম্ভবত আর নেই। ক্লাসরুম আমাকে কখনও টানত না, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই তাঁর লেকচার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বক্তৃতার ফাঁকে-ফাঁকে তিনি পাঠ-বহির্ভূত বিষয়-আশয়কেও প্রসঙ্গ করে তুলতেন। এ-রকম দু'টি ঘটনার কথা বলি। প্রথমটির সঙ্গে পাঠ-বিষয়ের যোগ অবশ্য আছে। একদিন তিনি 'সুভাষণ ও ট্যাবু' বিষয়ে বক্তৃতার শেষদিকে বললেন, 'যৌনপ্রাসঙ্গিক শব্দগুলোর ওপর নিষেধের চাপ এত বেশি থাকে যে, অনেক সময় নির্দোষ শব্দও উচ্চারণে কোনও-কোনও এলাকার মানুষ বিব্রত বোধ করে। যেমনÑ সোনা, দুধ, আদর, চুমু ইত্যাদি শব্দ। আরও বললেন, 'বিবাহিত মহিলারা বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় কথা বলে যার অধিকাংশই যৌনতা-সম্পর্কিত। তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো খুবই নির্দোষ, কিন্তু ব্যবহারের পর সে-সবের অর্থ আর নির্দোষ থাকে না; এভাবেও ঘটে যেতে পারে শব্দের অর্থের পতন।' বলার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সাত-আটজন মেয়ে দাঁড়িয়েও গেল। তাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'তোমরা কিছু বলতে চাও?' তারা বলল, 'আপনার কথাটা ঠিক না স্যার।' তিনি বললেন, 'কথাটা কি তোমরা মানছ না?' তারা একসঙ্গে বলল, 'না স্যার, মানছি না।' তিনি বললেন, 'না-মানলে প্রতিবাদ করতে হয়। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না। প্রতিবাদ হিসেবে তোমরা ওয়াকআউট করতে পারো।' সঙ্গে-সঙ্গে তারা ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে গেল, তাদের পিছু-পিছু বেরিয়ে গেল আরও কয়েকজন। তিনি আমাদের বললেন, 'বুঝেছ, যারা বেরিয়ে গেল তারা ছাত্রী হিসেবে এখানে আসেনি, এসেছে বিবাহিত মহিলার প্রতিনিধিত্ব করতে।' পনেরো দিন পর তারা ক্লাস করতে এল। তাদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'তোমাদের প্রতিবাদের মেয়াদ কি শেষ হলো, না-কি অনুপস্থিতির জন্যে পরীক্ষায় অংশ নিতে না-পারার কথা ভেবে এসেছ?'

ছেলেবেলা থেকেই ক্লাস ফাঁকি দেয়াটা ছিল আমার স্বভাবের একটা অংশ। যে-ক'টা ক্লাস করেছি বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে, আকর্ষণবশত, তাতে সৈয়দ আকরম হোসেন, নরেন বিশ্বাস, বেগম আকতার কামাল আর হুমায়ুন আজাদের ক্লাসই বেশি। স্বভাবের ওপর জোর খাটিয়ে যে তাদের লেকচার শুনতে যেতাম, তা নয়। তার পরও কেমন করে যে ফাঁকি পড়ে যেত! মামুন (এখন বিশিষ্ট অভিনেতা মামুনুল হক) ক্লাসে যাওয়ার সময় বলত, 'আরে বাদ দে, তুই হলি কবি, ক্লাস করব আমরা, তোর কবিতাই তো একদিন এখানে পাঠ্য হবে। চল, টিএসসিতে যাই, সঞ্জীবদা (কবি ও গায়ক সঞ্জীব চৌধুরী) আসবেন।' এমন-কি, গল্পকার জিয়া হাসান (এখন জিয়া হাশান) টিউটোরিয়াল পরীক্ষার সময় বলতেন, আপনার মতো একজন কবি পরীক্ষা দিতে যাবে এটা মানা যায় না। আপনার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আসেন চা খাই।

এইসব আপত্তি ও অনুরোধে সাড়া দিতে গিয়ে আমার বেশ ক'টা টিউটোরিয়াল ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে যদি কোনও বিষয় বা বইয়ের নেশা পেয়ে বসতো আমাকে, তাহলে তো কথাই নেই। এ-রকম একটা অবস্থায় টানা পনেরো দিন অনুপস্থিতির পর হুমায়ুন আজাদের ক্লাস করতে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি এতদিনের এই অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, 'স্যার, এই ক'টা দিন আমি নাটক নিয়ে, বিশেষত এ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে পড়াশুনা করেছি।' এটা অজুহাত ছিল না, আর তা হলেও তাতে কাজ হতে পারে বলে আমার জানা ছিল না। কিন্তু তিনি

বললেন, 'আজকের ক্লাসটা ভাষাবিজ্ঞানের পরিবর্তে এ্যাবসার্ড নাটক নিয়েই হবে।' আমার উদ্দেশে তিনি বললেন, 'তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে এ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে বলো। তারপর আমি বলবো।' আমার তখনকার সামর্থ্যে যতটা বলা সম্ভব ছিল, বললাম। এরপর পাক্কা পঁচিশ মিনিট তিনি এ-বিষয়ে যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে আরেক হুমায়ুন আজাদকে পাওয়া গেল।

'নন-কলেজিয়েট' হওয়ার অপরাধে আমাকে তৃতীয় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। যদিও আমি দেখেছি, অনেক 'রাজনীতি-করা' সহপাঠি, যারা কেবল মিছিলে যায় আর মধুর ক্যান্টিনে দিনভর আড্ডা দেয়, যাদেরকে বিভাগের বারান্দায়ও দেখা যায় না তারা ফর্ম-ফিলআপে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্লাসে কম উপস্থিতির পাশাপাশি, আমার ধারণা, আর একটি কারণ ছিল। সেটা আমি এখন বলতে চাই না। তো, এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে আমাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করতে বলা হলো এবং তাতে আটজন কোর্স শিক্ষকের স্বাক্ষর চাওয়া হলো। রাজীব হুমায়ুনের কাছে প্রথমে গেলাম। বুঝলাম, তিনি আমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট। বললেন, 'তোমার মতো বহু কবি আমি দেখেছি।' কাজ হচ্ছে না বুঝে আমিও বললাম, 'তা তো দেখারই কথা। কারণ, আপনার সময়ে অন্তত এক শ পঁচাত্তরজন কবির আবির্ভাব হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই ব্যর্থ, আপনি তো তাদেরই একজন।' গেলাম মোহাম্মদ আবু জাফরের কাছে। তিনি বললেন, 'তুমি কি রাজনীতি করো?' বললাম, 'না।' তিনি জানালেন যে, রাজনীতি করলে তার পক্ষে স্বাক্ষরটা দেয়া সম্ভব হতো। আমাকে দাঁড় করিয়ে তিনি আরও যা বললেন তার মূলকথা হলো, নন-কলেজিয়েট হওয়া অনেক বড় ব্যাপার, সেই যোগ্যতা কেবল রাজনীতি-করা ছাত্রদেরই আছে, আর তাদের অধিকার আছে যে-কোনও কাজে শিক্ষককে পাশে পাওয়ার। সেদিন আর কারও দরজার দিকে পা-বাড়ালাম না। পরদিন গেলাম বেগম আকতার কামালের কাছে। তিনি আমার দরখাস্ত পড়ে সেটা নিয়ে বের হয়ে গেলেন তাঁর রুম থেকে এবং চেয়ারম্যানের অফিসে ঢুকলেন। তাঁর পিছু-পিছু আমিও গেলাম, তবে দরজা পর্যন্ত গিয়ে থেমে থাকলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বর শুনতে পেলাম : অন্যদের কথা আমাকে বলে কী হবে, আমার কোর্সে সে ভালো করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বের হয়ে এলেন এবং তাঁর রুমে গিয়ে দরখাস্তে স্বাক্ষর করে সাইদ উর রহমানের কাছে যেতে বললেন। জানালেন যে, বিভাগের সাধারণ সভায় পরীক্ষায় আমার অংশগ্রহণের ব্যাপারে এজেন্ডা দেয়া হবে; সেখানেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তবে যে-ক'জনের স্বাক্ষর নেয়া যায়Ñ নিতে হবে এবং দরখাস্তটি সভার আগেই ডিপার্টমেন্টের অফিসে জমা দিতে হবে। দরখাস্তে একটা মাত্র স্বাক্ষর নিয়ে আমি হুমায়ুন আজাদের কাছে গেলাম। তিনি স্বাক্ষর করলেন এবং বললেন, 'তুমি যাতে পরীক্ষা দিতে পারো সেজন্যেই স্বাক্ষর করলাম, জনপ্রিয় হওয়ার জন্যে নয়।' আটজন কোর্স-শিক্ষকের স্বাক্ষর যেখানে দরকার, সেখানে মাত্র দু'জনের নিয়ে আমি তা জমা দিলাম। চেয়ারম্যান তখন সৈয়দ আকরম হোসেন। তাঁর সামনে দাঁড়াতেই আমাকে লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ-স্বরে বললেন, 'ডিপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কী-কী বলো সব আমার কানে আসে; এখানে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নেই, ব্যাকডেটেড সিলেবাস - তোমার সব কথা আমার কানে আসে। ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে গেছ, না?' আমি বললাম, 'যদি এটা সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনার খুশি হওয়ার কথা। এজন্য যে, সবাই কেবল নিজেদের ভালো রেজাল্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও একজন অন্তত বাংলা বিভাগের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবে।' তিনি বললেন, 'গেট আউট!'

সাইদ স্যারকেও ধরলাম। তিন দিন পর সাধারণ সভা হলো, কী-সিদ্ধান্ত হয়, জানার জন্যে ডিপার্টমেন্টের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময় (দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে) সাইদ স্যার সভাস্থল থেকে বের হয়ে জানালেন যে, পরীক্ষা দেয়ার পারমিশন পেয়েছি এবং আকরম স্যার আমার সঙ্গে কথা বলবেন। সভা শেষ হলে আমি চেয়ারম্যানের রুমে

ঢুকলাম। আকরম স্যার অনুমতির কাগজটা দিয়ে কী-কী করতে হবে বলে দিলেন। ঘটনাটা উল্লেখের লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। কারণ, পরদিন ডিপার্টমেন্টের সামনে আমাকে দেখে হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, ‘কী খবর, মন ভালো?’ এরপর থেকে দেখামাত্র তিনি এভাবেই কুশল জানতে চাইতেন। আমার তখনকার বিচলিত চেহারা হয়তো তাঁর মনকে খানিকটা নাড়া দিয়ে থাকবে।

যে-আবশ্যিক বিষয় তিনি পড়াতেন, সেটি ছাড়া তাঁকে খুব কম ছেলেমেয়েই শিক্ষক হিসেবে চাইত। কারণ, তিনি নম্বর দিতেন ‘কম’ এবং তাঁর সামনে যাওয়া মানেই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া। জ্ঞান অর্জন হোক বা না-হোক, প্রায় সবাই চাইত বেশি নম্বর, আর যে-সমাজে প্রশ্নের কোনও স্থান নেই, সেখানে কে তাঁর সামনে দাঁড়াতে চাইবে রুটিনমাফিক?

আমি আর আমার কয়েকজন সহপাঠি অবশ্য তা চেয়েছিলাম।

এমএ পড়ার সময় আধুনিক কবিতার একটি কোর্সে তাঁকে আমরা শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনÑ এই চার কবির কবিতা নিয়ে ছিল কোর্সটি; এর শিক্ষার্থীসংখ্যা এত কম ছিল যে, প্রথম দিনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ক্লাসটি হবে স্যারের চেম্বারেই। লেকচার থিয়েটার বিল্ডিংয়ে ছিল তাঁর চেম্বার, সেখানে আমরা ক্লাস করতাম। উপস্থিতি সাত-আট জনের বেশি হতো না। ওই কোর্সে তাঁর প্রথম লেকচার ছিল আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদ নিয়ে; রোম্যান্টিসিজম থেকে মডার্নিজমে উত্তরণের রূপটি কেমন ছিল বাংলা কবিতায়, তা-ও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমার খুব মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবার ফিরাও মোরে কবিতাটি তিনি আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, কবিতাটি বহন করছে রোম্যান্টিক নিঃসঙ্গ কবির বিশ্বাসী হয়ে-ওঠার দায়। কিন্তু বিশ্বাস খুবই ক্ষণস্থায়ী, ভেঙে পড়াই এর অনিবার্যতা। বিশ্বাস ভেঙে-পড়ার আগ পর্যন্ত আধুনিক হতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় লেকচারটি ছিল জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে; ঝরাপালক সম্পর্কে খানিকটা বলে ধূসর পাণ্ডুলিপি পড়াতে শুরু করেন। তারপর বনলতা সেন। মৃত্যুর আগে কবিতাটি তিনি আমাদের পড়ে শোনান; এ-কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ‘চিত্ররূপময়’ আখ্যার সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘বিশেষণটা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন কবিতাটির আর সব বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করার জন্যেই; কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, তাঁর এই আখ্যাটি বেশ প্রশংসাসূচক।’ বনলতা সেন কবিতাটিও তিনি পড়ে শোনান আমাদের। শোনানোর এক পর্যায়ে যখন পড়লেন ‘শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে’ তখন আমাকে বললেন, ‘এই কবি, তুমি বলো, এই উপমা কেন ব্যবহৃত হলো?’ মনে পড়ে, আমি বলেছিলাম ‘প্রতিদিনকার ব্যাপার বলে আমরা সন্ধ্যা কীভাবে আসে তা লক্ষ করি না; তেমনি শিশিরও শ্র“তির বিষয় হতে পারে।’

তিনি বললেন, ‘তোমার ব্যাখ্যাটা আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু শিশিরের কথা পরে বলে তুমি গোলমাল করে ফেলেছ। তুমি বলতে পারতে শিশির যেমন শ্র“তির বিষয় হতে পারে, তেমনি...।’ একেকটা ক্লাসের কথা একটু-একটু বললেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেগে যাবে।

তিনি নম্বর কম দিতেন এবং এ-নিয়ে কেউ কোনও কথা বললে এমন উক্তি করতেন, ব্যাপারটা প্রচলিত সামাজিক শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। যেমন, আমার এক সহপাঠিনী কোর্স টিউটোরিয়ালে আশানুরূপ নম্বর না-পেয়ে তাঁর সামনে এসে অভিযোগের মতো জানাল যে, তার আরও বেশি পাওয়ার কথা। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘শোনো, যে-কোনও উন্নতবক্ষা মহিলার চেয়ে বেশি নম্বর তুমি পেয়েছ।’ সহপাঠিনীটি তাঁর কক্ষ থেকে এক মুহূর্তও দেরি না-করে বেরিয়ে

গিয়েছিল। সে-যে সহজভাবে নেয়নি ব্যাপারটি, তা বুঝিয়ে দিলেও স্যার নির্বিকার। আমরা ভেবেছিলাম, এ-নিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। সেই সহপাঠিনীকে তিনদিন ক্যাম্পাসে না-দেখে আমাদের আশঙ্কা আরও প্রবল হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ দিন লক্ষ করলাম, টিউটোরিয়াল ক্লাসে দু'জন আগের মতোই স্বাভাবিক; বিশেষত স্যারের মধ্যে কোনও আড়ষ্টতাই দেখা গেল না। সম্ভবত তিনি ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছিলেন; নয়তো ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেননি। যা-খুশি তা বললে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বা ভাবমূর্তির যে সমস্যা দেখা দিতে পারে, সে-ব্যাপারে তাঁর মতো উদাসীন আমি খুব কম দেখেছি। যে যা-ই বলুক, তাঁর এই বৈশিষ্ট্য আমার ভালোই লাগত। এর চেয়ে বেশি ভালো লাগত, ছাত্রছাত্রীকে বকাঝকার পর কোথাও দেখা হলে, 'কী খবর তোমার' বলে নিঃশব্দ হাসিটুকু।

১৯৯৭ সালে, অনার্স গ্র্যাজুয়েশন উত্তীর্ণ হওয়ার পাঁচ বছর পর আকরম স্যারের বিশেষ সহযোগিতায় মাস্টার্সে ভর্তি হই। ১৯৯৪-র জুলাইয়ে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তখনও হুমায়ুন আজাদ বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান। ছাত্র হিসেবে আমি আবার তাঁর মুখোমুখি হলাম। একটা কাজে তাঁর রুমে ঢুকছিলাম। আমাকে দেখে এক শিক্ষক বললেন, 'যার কাছে যাচ্ছ দাপ্তরিক কাজের তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সৃষ্টিশীলতা দিয়ে সবকিছু হয় না। যাও যাও দুটো পা দেখে এসো।' আমি ঢুকেই দেখি, টেবিলের উপর দু'পা রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বই পড়ছেন। এক হাতে সিগারেট পুড়ছে, আরেক হাতে বইটি মেলে-ধরা, ফলে, তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

'স্যার কি ব্যস্ত?'

বইটি সরিয়ে তিনি বললেন, 'যা আমি করছিলাম তা কি তোমার কাছে আলস্য মনে হয়?'

আমার কাজের কথাটা তাঁকে বললাম। এ-ও বললাম, 'আপনি চেয়ারম্যান হওয়ায় অনেকেই সম্ভবত খুশি হন নাই।'

‘শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তারা তো খুশি হননি, তারা চেয়ারম্যান হতে পারেননি বা হতে দেরি হয়ে গেল বলে খুশি হননি।’ আরও বললেন, ‘সবার জীবনের লক্ষ্য যে চেয়ারম্যান হওয়া, এখানে না-বসলে আমি কোনও দিন বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আমি তো চেয়ারম্যান হতে চাইনি। অথচ এই চেয়ারটায় বসার খবর পেয়ে অনেকেই আমাকে অভিনন্দিত করেছে। কেরানি হওয়ার জন্যে অভিনন্দন। এ-সমাজে কেরানি হতে-পারাও একটা বড় সফলতা।’

আমি লক্ষ করেছি, বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক তাঁকে পছন্দ করতেন না। ঈর্ষাই তার একমাত্র উৎস বা কারণ, আমার তা মনে হয়নি। তার স্পষ্টবাদিতা, যা অনেকের ভাবমূর্তির জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিত; নিজের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত উঁচু ধারণাজনিত অহঙ্কার - এই দু’টি কারণেও অনেকে তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। ১৯৯০ সালে সাপ্তাহিক মূলধারায় ‘বাংলা একাডেমীর বই : ভুল ও বিকৃত অনুবাদের উৎসব’ শিরোনামে তাঁর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে কবীর চৌধুরীর অনুবাদগ্রন্থেরও ত্র“টি দেখিয়ে দেন তিনি। তবে ভয়াবহ অবস্থা ধরা পড়ে বাংলা বিভাগের পাঠ-তালিকায় স্থান-পাওয়া আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বইটির; এর লেখক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ তখন বিভাগের চেয়ারম্যান। বইটি ছাড়া তখন ছাত্রছাত্রীরা অসহায়, কারণ বাংলা ভাষায় এ-বিষয়ে আর কোনও বই, সম্ভবত ছিল না। অন্যদিকে, পাঠতালিকা থেকে প্রত্যাহারের দাবি উঠলে বইটি নিয়ে বিপদে পড়ে যায় কর্তৃপক্ষ। যতদূর জানি, এ-নিয়ে সভাও হয়েছিল, যাতে প্রস্তাব ওঠে বইটি সংশোধন করে পুনর্মুদ্রণের; কিন্তু কে করবে সংশোধন, গ্রন্থকার, না হুমায়ুন আজাদ? এই প্রশ্নে উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্যাপারটা একজন ছাত্র হিসেবে আমার মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। পরের বছর আমি যখন তাঁর ছাত্র, এ-নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, বইটি সংশোধন করা তার (মোরশেদ) পক্ষে অসম্ভব। কাজটি যদি উনি পারতেন তাহলে এই গোলমেলে বই তো তার পক্ষে লেখা সম্ভব হতো না। জানতে চাইলাম, এই দায়িত্বটা আপনি নেননি কেন? তিনি বললেন, ‘বইটায় এত গণ্ডগোল যে সংশোধন করতে গেলে আমারই লেখা হয়ে যায়। কিন্তু এর লেখক তো আমি নই।’ একদিন ফোনে তাঁকে বললাম, ‘আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান আপনিই লিখুন, আমরা আপনারটাই পড়ব।’ তিনি রেগে গেলেন। বললেন, ‘কেন লিখব? এটা সে-ই লিখবে যে পেনিনসুলা শব্দটির অর্থ জানে না, যদিও সপ্তম শ্রেণীর যে-কোনও বালককে জিজ্ঞেস করলে এর নির্ভুল উত্তরই পাওয়া যাবে।’ মোরশেদ-লিখিত ওই বইটিতে ‘পেনিনসুলা’ শব্দটির অর্থ ছিল ‘উপমহাদেশ’।

১৯৯৭-র কোনও একদিন মনিরুজ্জামান স্যারের রুমের সামনে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থামলেন। বারটি বৃহস্পতি এবং বেলা দুপুর বলে কলা ভবন তখন প্রায় ফাঁকা। আমাকে জিগ্যেস করলেন, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কার জন্যে? তারপর আঙুল তুললেন নেমপ্লেটের দিকে, ‘দেখেছ, প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান। এজন্যেই আমি নেমপ্লেটে নিজের নামের আগে প্রফেসর আর ডক্টর বাদ দিয়েছি।’

আমি বললাম, ‘উনি তো গীতিকার।’

‘ব্যর্থ কবিরাই গীতিকার হয়। আর, কী-গান লিখেছেন? তুমি কেন কোমরের বিছা হইলা না?’ সহকর্মী সম্পর্কে এ-ধরনের উক্তির আরও উদাহরণ আছে। এর আগে, ১৯৯১-র কোনও একদিন তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ক্লাসে পেছন দিক থেকে মৃদুস্বরে কথাবার্তা শুনে হুমায়ুন আজাদ সেখানে-বসা এক ছাত্রীকে ‘এই মহিলা, দাঁড়াও’ বললেন। তিনি কুড়ি

বছর বা তার বেশি বয়সের মেয়েদের 'মহিলা' বলতেন, সম্বোধনও করতেন। তো, সহপাঠিনীটি দাঁড়াল। অন্য কোনও শিক্ষক হলে জিগ্যেস করতেন, ক্লাসে কথা বলো কেন? বা, তাকে এটা বন্ধ করতে বলতেন। কঠোর হলে ক্লাসরুম থেকে বের করে দিতেন। শিক্ষক হুমায়ুন আজাদ হওয়ায় ছাত্রীটির প্রতি তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'কী বিষয়ে কথা বলছিলে?' সে জবাব না-দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন পড়াশোনার বাইরে সে কী করে। সহপাঠিনীটি উত্তর দিল, 'আবৃত্তি'। কিন্তু এমনভাবে সে উচ্চারণ করলÑ শব্দটি শোনাল 'আবড়িত্তি' এবং এখানে যে একটা 'ব' আছে, তা বোঝা গেল না। আমি দেখেছি, বাংলাদেশের আবৃত্তিশিল্পীরা শব্দটির উচ্চারণ এভাবেই করে।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এই উচ্চারণ কে তোমাকে শিখিয়েছে?'

সে নিরুত্তর।

'কার কাছে তুমি এটা শিখেছ?'

'নরেন স্যারের কাছে।'

'নরেন বিশ্বাস (হায়, আজ তিনিও নেই। হুমায়ুন আজাদের আগেই, ১৯৯৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়) তাহলে তোমাদের আবৃত্তি শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন! শোনো, ব-র উচ্চারণে দ্বিত্ব হয়, যদি তাতে ঋ-কার থাকে, আর উনি সে-জায়গায় ব-টাই উধাও করতে শেখাচ্ছেন তোমাদের! এইসব সোনাপণ্ডিতের জন্যে আমাদের মাতৃভাষার আজ এই দশা।'

১৯৯৭-র আর একটি দিনের কথা বলি। স্রেফ মজা করার জন্যে, তাঁকে রুমে একা পেয়ে বিভাগের শিক্ষকদের সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'এখানে রেজাল্টের জোরে শিক্ষক হওয়া যায়। এখন দেখছি এর সঙ্গে লবিংও লাগে। এখানে যারা প্রথম শ্রেণী পায়, দেখা গেছে তারা আমার কোর্স নেয়নি। নিলেও ভালো করেনি, কিন্তু অন্য শিক্ষকদের কোর্সগুলোয় এত ভালো নম্বর পেয়েছে, আমার কোর্সে থার্ড ক্লাস পেলেও তাদের সমস্যা নেই। তারা অশুদ্ধ বাক্য লিখলেও অন্য শিক্ষকরা তাদের নম্বর দিতে আনন্দ পান।' বললেন, 'প্রথম শ্রেণী পাওয়ার জন্যে অবশ্য আর-একটা যোগ্যতা লাগবে, সেটি হলো নিজে কিছু লিখতে না-পারা, ফলে, শিশুদের মতো মুখস্থ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। মুখস্থ করার ক্ষমতা যদি সবার সমান হতো তাহলে বাংলা বিভাগ খুব বিপদে পড়ে যেত, কারণ একই নোটে পরীক্ষা দিয়ে সবাই প্রথম শ্রেণী পেত।' আরও বললেন, 'তুমি দেখবে, এই বিভাগে কোনও সৃষ্টিশীল শিক্ষক নেই, যদিও একসময় তাদের কারও-কারও মধ্যে সেই সম্ভাবনা ছিল। এই বিভাগের কোনও শিক্ষকই চিন্তাশীল নন, কারও কোনও প্রশ্ন নেই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টাররা যেমন হাজিরা দিয়ে ক্লাসরুমে ঢোকেন আর বের হন, এখানকার শিক্ষকরা তেমনই। বছরের পর বছর তারা একই বিষয় পড়ান, একই বক্তৃতা দেন। সৃষ্টিশীল হলে, চিন্তাশীল হলে এমনটি হওয়ার কথা নয়।' আমি বললাম, 'আপনার কথা পুরোপুরি মানতে পারছি না। রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ আকরম হোসেন স্যার তো আছেন। তাঁরা কি কিছুই করেননি?' তিনি বললেন, 'তাঁরা দু'জনই জনপ্রিয়। দ্বিতীয়জন নিয়ে আমার অভিযোগ নেই, আগেরজনের ব্যাপারে আমার কথা হলো ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে উনি যে-কাজ করেছেন তা বেশ গুরত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে আরও কিছু করার সামর্থ্য তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি নজরুলের মাজারের খাদেম হয়ে গেছেন।'

এ-সব কথা যিনি বলেন, তিনি আর যা-ই হোন, সহকর্মীদের পছন্দের কেউ হতে পারেন না। তাঁরা যে প্রকাশ্যে তাঁকে নিয়ে গর্ব করতে পারতেন, সেই রাস্তা তিনি দিয়েছিলেন বন্ধ করে। ছাত্রছাত্রীদের বেলায় ব্যাপারটা তেমন না-হলেও, তাঁকে যে খুব পছন্দ তারা করত, এমন বলা যায় না, আমার সময়ে অন্তত তা দেখিনি। কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনও বিষয়ে জানতে চাইলে খুশি হতেন। কারও মধ্যে সম্ভাবনা দেখার পর তার পতন দেখলে তিনি প্রকাশ্যে হতাশা ব্যক্ত করতেন।

আমার প্রতি তাঁর কী মনোভাব ছিল, জানি না। হয়তো তা আট-দশজন ছাত্রের প্রতি যা হওয়ার কথা, তার বেশি কিছু হবে না। তা না-হোক, আমার আরও কিছু স্মৃতি আছে লেখক হিসেবে, তাঁকে নিয়ে। সে-সব আরেকটি পর্বের জন্যে রেখে দিলাম।

মনিপুরীপাড়া, ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৭

chanchalashraf1969@yahoo.com

(ছবিতে হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে লেখক, প্রয়াত কবি আন্‌ওয়ার আহমদ-এর জন্মদিনে তার বাসায়; ছবি : আন্‌ওয়ার আহমদ, ১৯৯২)